বসন্তমঞ্জরী

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আকাশবাণী কলকাতা থেকে একটি ধারাবাহিক বারোয়ারিউপন্যাস প্রচারিত হয়েছিল। এক-একটি পরিচ্ছেদ তৎকালের এক-একজন বিখ্যাত লেখক তাঁর স্বকণ্ঠে পড়ে শুনিয়েছিলেন। একটি পরিচ্ছেদের দায়িত্ব ছিল বিভূতিভূষণের উপর। মূল গল্পের মধ্যে না গিয়ে তিনি লিখেছিলেন এই বসন্তমঞ্জরী, যা প্রায় একটি পৃথক ছোটগল্প। এটি বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন হিমানীশ গোস্বামী। সবসুদ্ধ১৫টি পরিচ্ছেদ পড়া হয়েছিল বলে প্রকাশকালে এর নাম দেওয়া হয়েছিল পঞ্চদশী।গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় রাসপূর্ণিমা ১৩৪৮, নভেম্বর ১৯৪১ সালে। এর মধ্যেবিভূতিভূষণের রচনাটি ১২২-১৩৬ পৃষ্ঠার মধ্যে মুদ্রিত হয়েছিল।

নির্বাহী সম্পাদক।

রতনপুর গ্রামটি খুব বড়, সেকেলের ইঁটের গাঁথুনি মন্দির গ্রামের নানাস্থানে বন-জঙ্গলেরমধ্যে ছড়ানো রয়েছে। রতনদীঘি বলে একটা প্রকাণ্ড দীঘি গ্রামের মাঝখানে—পুরোনো আমলে রতন রায় বলে কে একজন রাজা ছিলেন নাকি এ অঞ্চলে, তাঁর নামেই গ্রামেরনাম।

গ্রামে আধুনিকতাও ঢুকেছে। একটা ছেলেদের হাই স্কুল, একটা মেয়েদের হাই স্কুল, একটা লাইব্রেরী—এমনকি একটা টাউনহল পর্যন্ত আছে। অবিশ্যি সবই মফঃস্বলেরছোট মাপকাঠির মাপে। মঞ্জরী ঢুকে দেখলে গ্রাম বড় হলে কি হবে, বেশ জঙ্গল গ্রামেরমধ্যেই। বোধ হয় বেশ ম্যালেরিয়াও আছে। বাংলার কোন্ গ্রামেই বা নেই। ইস্কুলেরসেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে গেল। শোনা গেল তিনি অসুস্থ, বুড়ো মানুষ—বাতের বেদনাতে আজ কয়েকদিন শয্যাগত। সেক্রেটারিবাবুর বাড়ির একটি ছেলে মঞ্জরীকে তাদের স্কুলে নিয়ে এল। কাল স্কুল খুলবে। ছুটির পরে। দেড় মাস বন্ধ ছিল, স্কুলের উঠোনে এক হাত করে জঙ্গল গজিয়েছে বর্ষার জলে—সানের রোয়াকে শেওলা ধরেছে। শিক্ষয়িত্রীদের থাকবার বন্দোবস্ত স্কুলেই—স্কুলবাড়ির পেছনে তিনখানি ঘর, একখানিতে হেড মিস্ট্রেস, অন্য দুইখানিতে আর তিনজন টিচার থাকেন। মঞ্জরী গিয়েদেখলে একজন প্রৌঢ়া, টিচারদের নির্দিষ্ট ঘরের সামনে বসে বাসন মাজছেন রোয়াকেরওপরই। মঞ্জরীকে দেখে তিনি হাতের কাজ ফেলে ছুটে এসে বললেন,—কে মা তুমি, কোত্থেকে আসছো?

মঞ্জরী বললে, আমি নতুন হেড মিস্ট্রেস অ্যাপয়েন্টেড্ হয়েছি। আজ এলাম।

বৃদ্ধা অবাক হয়ে বললেন, ওমা আপনি? এত কম বয়েস হবে আপনার তাভাবিনি—আসুন, আসুন।

মঞ্জরীর জন্যে নির্দিষ্ট ঘর চাবি দেওয়া ছিল। ছেলেটি চাবি খুলে দিয়ে চলে গেল।জিনিসপত্রের মধ্যে মঞ্জরীর ছিল কেবল একটি ট্রাঙ্ক ও একটি বিছানার পুঁটুলি। ছেলেটিসেগুলো নিজেই ঘরের মধ্যে তুলে দিল। প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রীটি নিজের ঘর থেকে পাখাএনে হাওয়া করতে বসলেন। মঞ্জরী বাধা দিতে গেলে কিছুতেই শুনলেন না, বললেন, মা, আপনি তো আমার মেয়ের বয়সী—আপনাকে—

মঞ্জরী বললে, তবে আমাকে আর 'আপনি' বলে ডাকবেন না। এখন থেকে 'তুমি'বলেই ডাকুন না কেন?

প্রৌঢ়া বললেন, সকলের সাক্ষাতে 'তুমি' বলা চলবে না মা। তুমি হলে স্কুলের হেড মিস্ট্রেস, তাতে সেক্রেটারি চটবেন। ভারি কড়া লোক। এখানে থার্ড টিচার মালতী, আমায় বলেছিল 'তুমি'। নতুন বয়েস, আই. এ. পাশ—ভাবলে কি না জানি হনু। দিলেন আচ্ছা করে ধমকে সেক্রেটারি। আসেননি এখনো—কাল স্কুল খুলবে—বোধ হয় আজই আসবে ওবেলা তিনটের গাড়িতে, দেখো এখন এলে পরে—

মঞ্জরী কাপড় জামা বদলে সুস্থ হয়ে বসল। পুরোনো নোনাধরা ইঁটের দেওয়াল।বোধ হয় কারো পুরোনো পরিত্যক্ত বাড়িতে স্কুলের টিচারদের থাকবার ব্যবস্থা করাহয়েছে। জানালা দিয়ে জলবিছুটির লতা ঘরে ঢুকতে চাইছে। ঘরের পেছনটাতে ঘন আগাছার জঙ্গল, একটা কাঁঠাল গাছ, একটা ডুমুর গাছ, আরও কি কি বড় গাছ—সবসুদ্ধ মিলে জায়গাটা যেন ঝুপসি মতো। এমন জায়গায় মঞ্জরী কখনো থাকেনি একা, ওর মন বড় দমে গেল। প্রৌঢ়া মহিলাটির নাম কাদম্বিনী মিত্র—মঞ্জরী ক্রমেজানলে।

বিকেলের দিকে মঞ্জরী একা মনমরা ভাবে বসে আছে—কাদম্বিনী এসে বললেন, চা খাওয়া অভ্যেস আছে তো? এসো আমার ঘরে। তুমি তো এসে কিছু খাওনি। চলোকিছু মুখে দেবে।

মঞ্জরী খেয়েই বেরিয়েছিল বলে এখানে এসে খাওয়ার তথা রান্নার হাঙ্গামা করেনি—তাছাড়া সে দেখলে এখানে পাচক বা চাকর নেই—টিচারদের ঘরের পেছনে টিনের শেড দেওয়া রান্নাঘর; রান্নাবান্না যে যার নিজেই করে। একবার ইতিমধ্যে সেরান্নাঘর খুলে দেখেও এসেছে। এত দিন ছুটিতে বন্ধ ছিল, বেজায় নোংরা হয়ে আছে। ঝাড়-পোঁছ করতে দুটি ঘণ্টা। আরশোলা ও নেংটি ইঁদুরের বাসা কায়েম হয়ে আছেআজ দু'মাস। কে সে-সব পরিষ্কার করে দেবে? মঞ্জরী আরশোলাকে বড়ো ভয় করে।

জীবনটা কি হয়ে গেল! কে এরকম ভেবেছিল? যখন এম.এ. পাশ করে, তখন কত আশা, কত উৎসাহ, জীবনে কত উন্নতি করবে সে, বিধবা মায়ের দারিদ্র্য ঘোচাবে।কত বড় পদ না জানি পাবে। শেষকালে কিনা এই অজ পাড়াগাঁয়ে মেয়ে ইস্কুলেরমাস্টারি! অদৃষ্টে এই লেখা ছিল শেষে। অন্ধকার নেমে এল। বর্ষার পরে পুরোনো স্কুলবাড়ির চারিপাশের আগাছার জঙ্গলে মশা বিন্ বিন্ করছে। গাছের পাতা নড়ে না, ভীষণ গুমোট। পাড়াগাঁয়ে হাওয়া কম, জঙ্গলের গাছপালায় হাওয়া আটকেছে—এর ওপর আবার মশারি খাটিয়ে শুতে হবে মশার উৎপাতে। ঘুম যা হবে এখন!

কাদম্বিনীর নিজের কথাই পাঁচ কাহন। বুড়ো হয়েছেন বলেই বোধ হয় একটু বেশি বকেন। বললেন, একলাটি বসে আছ মা?মনমরা হয়ে আছ দেখতেই পাচ্ছি, ছেলেমোনুষ হাজার হোক, মায়ের কাছ থেকে এসেছ। বড্ড খারাপ জায়গা এ বাপু। মন বসে না। তবে কি করবো, গরিব মানুষ, এখানেই পড়ে আছি আজ তেরো বছর।ছেলে রেলে চাকরি করে, সোদপুরে টিকিট কালেক্টার, চল্লিশ টাকা মাইনে পায়, তানিজের সংসার নিয়ে নেনজার হয়ে পড়েছে। আমায় বলে—মা এসো—আমাদেরসঙ্গেই থাকো।

মঞ্জরী বললে, গেলেই পারেন মাসীমা!

—যাবোকি মা, রেলের কোয়ার্টার। দু'খানা মোটে ঘর। চার পাঁচটি ছেলেপিলে—সব সময় ট্যাঁ ভ্যাঁ চিৎকার। বিছানাপত্তার কাপড়-চোপড় সব নোংরা করে ফেলে। আমি বিধবা, অত অনাচার কি আমার পোষাবে মা? তাছাড়া ছেলের ঘাড়েও আর বোঝাচাপাতে মন সরে না। এমনিতেই সে নেনজার হয়ে আছে। তিনি মারা গিয়েছেন আজএই ষোল বছর, তিনটি বছর দেশের বাড়িতে ছিলাম, তখন ছেলে স্কুলে পড়ত— তারপর চাকরি-বাকরি পেলে—ছেলের বিয়ে দিলাম—এখন তফাত হয়েই আছি।তোমার কাছে বলতে কি মা, বৌমা মানুষ ভাল না—আমার সেখানে থাকতে আরওভাল লাগে না তার জন্যে। তার চেয়ে তফাতে আছি, ভালই আছি মা।—

মঞ্জরী দেখলে তিনি এখানে রীতিমত সংসার পেতে বসেছেন। টিচারদের জন্যেনির্দিষ্ট দুটি ঘরের একটিতে তিনি এবং অপর একটি টিচার থাকেন। অপর টিচারটিএখনও আসেননি, কাদম্বিনীর নিজের জিনিসপত্রে ঘর ভর্তি—দু'তিনটি বাক্স, চালের বস্তা, কয়েক ভাঁড় গুড় আরও সব নানা আকারের হাঁড়ি-কলসী-জালা ইত্যাদি ঘরেঠাসা। আধময়লা থানকাপড় বাঁশের আনলায় টাঙানো। কাদম্বিনী বললেন, আমার সঙ্গে মালতী বলে একজন টিচার

থাকে—বিধবা, ওই যার কথা তোমায় বলেছিলুম মা। তার ঠ্যাকার আছে বেশ। পেটে বিদ্যে কম থাকলে যা হয় আর কি!

এসব কথা মঞ্জরীর ভাল লাগে না। শুধু মালতী নয়, দুনিয়ার কারো সঙ্গে তাঁর যেসদ্ভাব আছে, প্রৌঢ়ার কথাবার্তা শুনে তো মনে হয় না। মঞ্জরী ছটফটকরতে লাগল কতক্ষণে উঠে নিজের ঘরে গিয়ে একলাটি চুপ করে বসবে—এঁর সঙ্গের চেয়ে তাও যেন অনেক ভালো। মঞ্জরী শোভনতার খাতিরে দু' একটা 'হুঁ' 'হ্যাঁ' দিয়ে আরওকিছুক্ষণ বসে থাকবার পরে বললে, তাহলে এখন উঠি মাসীমা। আপনি বসুন। আবার হাঁড়ি চড়িয়ে যা হয় দুটি ফুটিয়ে নিতে হবে তো?

কয়েকদিন কেটে গেল। সেক্রেটারি তাকে একখানা পত্র পাঠালেন, তিনি বাতেরব্যথায় কাতর, জরুরী কাজ আছে, একটু সামলে উঠলেই দেখা করবেন তিনি। মঞ্জরী কখনও এর আগে মাস্টারি করেনি, এ কাজ তার খুব ভালো লাগে না। অনেক বড়বড় আদর্শবাদের কথা সে নিজের মুখেই কত আউড়ে গেছে—কিন্তু বাস্তবতার সংস্পর্শে এসে তার সে আদর্শবাদ ভেঙেচুরে যেতে বসেছে। ছাত্রীরা অমনোযোগী, ভীষণ দুষ্টু, একটু কড়া কথা বললে নাকি বাড়ি থেকে পত্র আনবার ভয় দেখায়, কাদম্বিনীর মুখে শুনলে সে। মঞ্জরী ভাবে সত্যিকার আদর্শ শিক্ষয়িত্রীর গুণ হয়তো তারনিজের মধ্যে নেই। এ কাজের জন্যে সে তৈরি হয়নি। এছাড়া আবার আছে ঘরেরবিবাদ। কাদম্বিনীর সঙ্গে থার্ড টিচার মালতীর একেবারেই বনে না। একদিন স্কুলেরপরে দুজনে চুলোচুলি ঝগড়া বেধে গেল।

মালতী বলছে, আপনি টিচার, আমিও তো বানের জলে ভেসে আসিনি। সেক্রেটারিযখন এই একটা ঘর দুজনের জন্যে করে দিয়েছেন—তখন আপনি আপনার নিজেরজিনিসপত্তরে ঘর ভরিয়ে বসবেন এই বা কেমন কথা! আমার নিজের দু-একখানাকাপড়, দু-একটা ভাঙা তোরঙ্গ থাকতে পারে না কি?

কাদম্বিনী এর উত্তরে সমান জোরে চিৎকার করে বলছেন, আ মোলো যা, আবার মুখের ওপর লম্বা লম্বা কথা বলতে এসেছেন উনি! আমরা সিনিয়র টিচার, আমাদেরমুখের সামনে কথা?সেক্রেটারি সেদিন কি শিখিয়ে দিয়েছেন মনে নেই?

মালতী এবার রীতিমত ক্ষেপে উঠে খুব ভীষণ গোছের কি একটা করতেযাচ্ছিল—সামনে হেড মিস্ট্রেসকে দেখে বেচারী নিজেকে সামলে তো নিলেই, এমনকি কেঁদে ফেললে।

মঞ্জরী বললে, এসব কি হচ্চে আপনাদের? মেয়েরা এখনও কেউ কেউ হয়তোকম্পাউন্ডে খেলা করছে—তারা যদি শোনে তাদের টিচারদের মধ্যে এই ধরনের ঝগড়া চলছে—তারা কি ভাববে বলুন তো?

মালতী কাঁদো-কাঁদো সুরে বললে, আপনিই বিচার করুন দিদি, যখন এসে পড়েছেন। উনি ঘরে সব জিনিসপত্র রাখবেন—আমার কোন জিনিস ছোঁবার জো নেই—এতে গা ঠেকল, ও কাপড় উড়ে পড়ল, সব আমার অনাচার, সব আমার অপবিত্র—এ করলে আমি কি করে টিকি দিদিমণি?

মঞ্জরী এত দিনে ভাল করেই বুঝেছে, বৃদ্ধা রীতিমত শুচিবাইগ্রস্ত—কিন্তু 'মায়ের বয়সী' তিনি, মঞ্জরীর মন সরল না তাকে তিরস্কার করতে বা কিছু কড়া কথা শুনিয়েদিতে। মালতীর হাত ধরে সে স্কুলের ওপাশের উঠোনে টেনে নিয়ে গেল। বুঝিয়ে বললে, ছিঃ, অমন বললো না মালতী। উনি আমাদের মায়ের বয়সী—শোকে দুঃখেঅমন হয়ে গেছেন। এই অজ পাড়াগাঁয়ে আজ তেরো বছর একলাটি বাস করলে মানুষকি আর মানুষ থাকে ভাই?

মালতী শান্ত হল। বসে বসে সে নিজের সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে অনেক কথাই বললে। তারও কেউ নেই—থাকলে কি আর মরতে এসেছে এই তেপান্তরের পুরীতে মাস্টারি করতে? সে বিয়ের চার বছর পরেই বিধবা হয়—বাপের বাড়ি কেউ নেই, এক বৈমাত্রভাই ছাড়া। শ্বশুরকুলেও কেউ নেই। জনৈক সহৃদয় আত্মীয়ের সাহায্যে ও উৎসাহে সে

জুনিয়ার ট্রেনিং পাশ করে ইস্কুল-মাস্টারিতে ঢুকেছে। যতই কষ্ট হোক তবুও তো পরেরগলগ্রহ হওয়ার চেয়ে ভালো। মঞ্জরীর মন এই তরুণীর ওপর সহানুভূতিতে ভরেউঠল। মঞ্জরী তাকে অনেক আশা ও উৎসাহের কথা বললে। নিজের জীবনেরকাহিনীও কিছু কিছু শোনালে।

মালতী ক্রমে শুরু করলে তার স্বামীর কথা। মালতীর স্বামী দেখে শুনে পছন্দ করে নাকি তাকে বিয়ে করেছিল, তাকে কি ভালোই বাসতেন তিনি। গরমের দিন কখনওদু-বেলা রাঁধতে দিতেন না পাছে তার কষ্ট হয়। কখনো একটা কড়া কথা বলেননি ওকে। একবার অসাবধানে একটা সোনার দুল হারিয়ে ফেলেছিলুম, নতুন গড়িয়ে এনে দিয়েছিলেন তিনি, কোনো কথা বলেননি এ নিয়ে। ওকে বলতেন—মালতী, হাতে পয়সা হলে চলো আমরা পশ্চিমে গিয়ে বাস করবো—এদেশে বড়ো ম্যালেরিয়া। হাতে টাকাটা সিকিটা দিয়ে জমাতে বলতেন ওকে। এই রকম সব কত ধরনের কথা।শুধুই ওর স্বামীর সম্বন্ধে। কথা শেষ করে মালতী চোখের জল ফেলে বললে, আজবেঁচে থাকলে তার ষাট টাকা মাইনে হত এতদিনে। ডায়মন্ডহারবারে বাসা করবেনবলেছিলেন। তা নিতান্ত মন্দ কপাল আমার। মন্দ কপালই যদি না হবে তবে আজ আমারই এক সাজানো সংসার তাই ফেলে কি আসি এইখানে মাস্টারি করে মরতে!নিজের ঘর-সংসার স্বামী-পুত্তুরের চেয়ে মেয়েমানুষের আর কি ভালো লাগে!—মালতী উঠে রাঁধতে চলে গেল।

মঞ্জরী বসে বসে ভাবতে লাগল। মালতীর মুখে তার স্বামীর গল্প এর আগেও একদিন সে শুনেছে। এত ভাল লাগে ওর সেই একই গল্প করতে? কেন এত ভাললাগে? মঞ্জরী ঠিকমতো বুঝতে পারে না। তবুও ওর মনের মধ্যে যেন একটাকৌতূহল জাগে সেই অনাস্বাদিত জীবনের অনেক কথা বুঝতে বা জানতে। স্বামী নাথাকলে কি আসে যায় মেয়েমানুষের? মালতী এত কি আনন্দ পেয়েছিল সামান্য কয়টি বছরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে যে, এতদিনেও সেকথা সে ভুলতে পারলে না, সময়ে অসময়ে সেই ক'টি বছরের স্মৃতি ওর মনে ব্যথাভরা আনন্দ যোগায়?

মঞ্জরী খানিকটা বোঝে, খানিকটা বোঝে না। মন যেন উদাস হয়ে যায়—হাতছানিদিয়ে তাকেও যেন ডাকে তার নিজের জীবনেরই আশাভরা কোনো কোনো দিনেরস্মৃতি—তারা ওকে ডেকে নিয়ে যেতে চায় এ অন্ধকার গহন সমাধিতল থেকে আলোর রাজ্যে—কিন্তু কোথায় সে যাবে? কতদূরে—কোথায় সে আলোর রাজ্য?

সেদিন স্কুলের কমিটির মিটিং। মঞ্জরী খাতাপত্র নিয়ে স্কুলের আপিসঘরে বসেআছে, সেক্রেটারি এবং অন্যান্য মেম্বারদের প্রতীক্ষায়—এমন সময়ে একটা ঘোড়ারগাড়ি এসে স্কুলের দরজায় দাঁড়াল। নামলেন জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তার পেছনে যিনি নামলেন তাঁকে দেখে মঞ্জরীর যেন মাথা ঘুরে উঠল। বসন্তবাবু—জামাইবাবু এখানেএলেন কোথা থেকে? এখানকার স্কুলের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, মা, তোমার সঙ্গে এত দিন দেখা করতেপারিনি বাতের ব্যথায়। তুমি আমাদের লক্ষ্মী মা, যেমন রতনপুরে এসেছ অমনিআমাদের লক্ষ্মী ভাগ্যি উথলে উঠেছে। এই বসন্তবাবুই তার মূলে—তোমার আত্মীয়বলেই তো উনি আজ এখানে এসে আমাদের ধন্য করছেন।

মঞ্জরীর কাছে সেক্রেটারির এ কথা অর্থহীন ও দুর্বোধ্য বলে মনে হল। সে এখানে চাকুরিতে যোগ দেওয়ার পরে কি এমন লক্ষ্মীলাভ ঘটল রতনপুরের ভাগ্যে?

বসন্ত হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, ভাল আছ মঞ্জরী? স্কুলের কাজ লাগছে কেমন বলো?—

মঞ্জরীর মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হল না—

স্কুল কমিটির মিটিং আরম্ভ হল। সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর সামনে সেক্রেটারিশ্যামসুন্দরবাবু সকৃতজ্ঞ স্বরে ঘোষণা করলেন—কলিকাতার সহৃদয় ধনী শ্রীযুক্তবসন্তকুমার চৌধুরী মহাশয় রতনপুর মেয়ে স্কুলে এক লক্ষ টাকা দান

করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আজই সেটার লেখাপড়া হবে এবং সকলের উপস্থিতিতে একটা ট্রাস্ট কমিটিগঠিত হবে আজই। টাকাটা ট্রাস্টের হাতে আজই দেওয়া হবে, এজন্যে আলিপুর থেকেউকিল মাখনবাবু এসে পৌঁছবেন বেলা দুটোর ট্রেনে। তিনি এলেই কাজ আরম্ভ হবেলেখাপড়ার। এর পরে হেড্‌মিস্ট্রেসের মাসিক বেতন দু'শো টাকা করে দেওয়া হবে, টাকা দেওয়ার এও একটি প্রধান শর্ত। আজ মুসাবিদার কাজ হয়ে গেলে আগামীসোমবার দলিল রেজেস্টারি হবার দিন ধার্য হয়েছে।

হর্ষ কোলাহলের মধ্যে শ্যামসুন্দরবাবু বসে পড়লেন।

মঞ্জরীর মাথা ঘুরছিল। এসব সে কি শুনছে? এসব স্বপ্ন না তার মতিভ্রম? বসন্তবাবু এখানে এসেছেন তারই জন্যে—তারই জন্যে এ স্কুলে এক লক্ষ টাকা দান করেছেন! অর্থ কি এর?

উকিলবাবু এখনও এসে হাজির হননি—কমিটির মিটিং আপাতত শেষ হল। মঞ্জরী ইঙ্গিতে বসন্তকে স্কুলের মাঠে ডেকে নিয়ে গেল। পূর্ণদৃষ্টিতে বসন্তের মুখের দিকে চেয়ে বললে, এসব কি জামাইবাবু? এখানে কেন আবার এলেন আমায় উত্ত্যক্তকরতে? হেনা কোথায়? বিয়ে কবে আপনাদের?

বসন্ত হাসিমুখে বললেন, বিয়ের ইতি হয়ে গেছে। এনগেজমেন্ট ক্যানসেল্‌ড!—

মঞ্জরী অবাক হয়ে বললে, সে কি কথা! কবে এসব ঘটল? তা ছাড়া আপনি রতনপুরেই বা কবে এসেছিলেন, ওসব লাখ টাকা দানের এবং হেড্‌মিস্ট্রেসের দু'শটাকা করবার ব্যবস্থাই বা কবে করে গেলেন?

বসন্ত সব কথা খুলে বললে। মঞ্জরী স্থিরভাবে শুনে প্রথমটা চুপ করে রইল, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললে, জামাইবাবু, আপনি ত্রিশ লাখ টাকার মালিক হতে পারেন, কিন্তু আপনি ভাববেন না সেজন্য আমাকে আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা নিতেই হবে।আপনার কিছু কষ্ট করতে হবে না আমার জন্যে। রতনপুর স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের মাইনে আপনি হাজার টাকা করে দিন না—তাতেই বা কি?

—তার মানে?

—তার মানে আমি কাজে রিজাইন দিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি—

—কেন?

—আমার খুশি। আপনার তাতে কি বলবার আছে শুনি? যা-খুশি করবারস্বাধীনতা আমার নেই?

—কিন্তু জীবনটাকে নিয়ে যা-তা করবার স্বাধীনতা তোমার আছে কিনা সন্দেহ।আমার কথা শোনো। তোমার মায়ের মুখের দিকে তাকাও। অমনি যে একখানা চিঠি লিখে পালিয়ে এলে, তিনি তো কেঁদেই সারা। আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর বরংতোমার ঘরে—আমি আসছি—

বসন্ত স্কুলঘরের দিকে চলে গেলেন। মঞ্জরীর মাথা যেন বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল, সে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এসব কি ঘটনা ঘটে গেল আজ সকালথেকে! রতনপুরে জামাইবাবুর আকস্মিক আবির্ভাব এবং তার স্কুলে এক লক্ষ টাকাদান—যার প্রধান শর্ত হেড্‌মিস্ট্রেসের মাইনে হবে দুশো টাকা—এ সবের অর্থ কি? সেকি জন্যে এখানে থাকবে? এই কদিন এখানে কাজ করেই সে বুঝেছে মেয়ে পড়াবার জন্যে সে তৈরি হয়নি। এ কাজের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে দিতে পারবে না সে।মালতীর মুখে বিবাহিত জীবনের সুখস্মৃতির গল্প শুনতে শুনতে তার বুকের ভেতরটাজ্বালা করে ওঠে কেন তবে? কি চায় তার মন? সে নিজেকে রতনপুরের স্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেসরূপে কল্পনা করলে এরও দশ বছর পরে। দু'শো টাকা মাইনেবটে কিন্তুতাতে কি কোন সুখ আছে তার? তাতে সে কি নিজেকে খুব সুখী মনে করবে? দশবছর কি আরও বিশ বছর পরে এই নিরালা পল্লীপ্রান্তে একদিন এক দন্তহীনা, পক্বকেশা প্রৌঢ়া স্কুল মাস্টারনীকে দেখে কেউ কি বুঝবে এর নাম ছিল মঞ্জরী! একদিন

এরওছিল রূপ, ছিল যৌবন, মনে ছিল নারীসুলভ সহস্র সাধ-আহ্লাদ! সে-সব সাধের গোপন সমাধি তখন রচিত হয়ে গেছে বহুকাল। যেমন হয়েছে ওই কাদম্বিনী মিত্রের। সেও হয়তো একদিন অমনি খিটখিটে মেজাজের শুচিবাইগ্রস্ত প্রৌঢ়াতে পরিণত হবে। অমনিনিজের তুচ্ছ জিনিসে ঘর ভরিয়ে রাখবে আর কাউকে সে ঘরে জায়গা দেবে না—নিজের সব কিছু ভাববে শুদ্ধ ও পবিত্র—অপরের যা কিছু সব নোংরা। ওই যে তরুণী মালতী—এখনও ওর মনে রসের অনুভূতি সজাগ আছে তাই স্বামীর কথা বলে। পুরোনো দিনের স্মৃতির ধ্যানে সহসা হয় উন্মনা। কিন্তু চাকুরি-জীবনের নীরস মরুভূমির উত্তাপে সে সব মনোভাব টিকবে কতদিন? একদিন ঐ মালতী হয়ে উঠবেকাদম্বিনী মিত্র। সে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, তাকেও হতে হবে তাই। হয়ত বা এইতার অদৃষ্টলিপি। কে জানে? হঠাৎ চোখের জলকে রোধ করবার প্রাণপণ চেষ্টায় সেবালিশে মুখ গুঁজলে। দোরের কাছে কিসের শব্দে সে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। যত দ্রুতসম্ভব চোখ মুছে ফেলে নিজেকে সংযত করে নিল। দোরের পাশে দাঁড়িয়ে মালতী। তার মুখে ভয়ের চিহ্ন। সে জিগ্‌গেস করলে, কি মালতী?—

মালতী গলার সুর নিচু করে বললে, দিদিমণি, উনি আমার নামে কমিটিতে কিছুকমপ্লেন করেছেন?

মঞ্জরী বুঝলে, উনি অর্থে কাদম্বিনী। বড় মায়া হল তার এই ভীরু, অসহায়মেয়েটির ওপর। কেউ নেই সংসারে—ছেলেমানুষ,—নিতান্ত মন্দ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মেছিল।দুদিনের বাঁধা সুখ-নীড়টির স্বপ্নের ঘোর এখনও ওর চোখে মুখে। সে সস্নেহ কণ্ঠেবললে, না মালতী, কে বললে উনি কমপ্লেন করেছেন? আমি হেড্‌মিস্ট্রেস, সব যা কিছু আমার হাত দিয়ে তবে তো সেক্রেটারির কাছে যাবে? সেজন্য কিছু ভেবো না তুমি।

মালতী পা টিপে টিপে চলে গেল। বোধ হয় পাছে কাদম্বিনী মিত্র টের পান সেই ভয়ে। মঞ্জরী জানে প্রৌঢ়া এখন ওদিকে রান্নাঘরে রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত আছেন। মালতীযাওয়ার অল্প পরেই বাইরের রোয়াকে জুতোর শব্দ শুনে মঞ্জরী চেয়ে দেখলে—স্বয়ংবসন্ত চৌধুরী তার ঘর খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছেন। মঞ্জরী বললে,—এই যেজামাইবাবু!

বসন্ত ঘরে ঢুকে টুলের ওপরে বসলেন। চারিদিকে চেয়ে বললেন,—রামোঃ, এইঘরে মানুষ থাকে?—এসব আমি বদলে দেব—

—আপনি আমার একটা কথা রাখবেন জামাইবাবু?

—হ্যাঁ, বলো বলো, কেন রাখব না?

—এখানে মালতী বলে একটি মেয়ে আছে, থার্ড টিচার—বড়ো দুঃখী। তার জন্যে আপনাকে একটা কিছু করতে হবে।

—বলো কি করতে হবে?...তিনি মাইনে পান কত?

—কুড়ি টাকা লেখে, পায় সতেরো টাকা। এখানে সব ঐ রকমই ব্যবস্থা।

—আমি আজই কমিটিতে কথা বলছি—তার মাইনে পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়াহবে, কি বলো?

—তাতে গোলমাল আছে। সিনিয়র টিচার আরও যাঁরা আছেন তাঁরা আপত্তি তুলবেন।

—মঞ্জরী এ সম্বন্ধে তুমি আমাকে আর লেকচার ঝাড়বে না। আমি যখন টাকাদিচ্ছি ইস্কুলের জন্যে তখন আমার সব স্বত্ব এখানে অটুট রাখবো।

—যথেষ্ট ধন্যবাদ এজন্যে জামাইবাবু, কিন্তু আমার লেটার অফ রেজিগ্‌নেশানটাওঅমনি সেই সঙ্গে কমিটিতে পাশ করিয়ে নেবেন। আমি এখানে থাকব না—

—কেন?

—ইস্কুলের চাকরিতে আমার আর মন নেই। আর যদি করতেই হয়, তবে অন্য ইস্কুলে গিয়ে করব।

বসন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন—মঞ্জরীর চোখে জল টলটল করছে। নাঃ, এই সব মেয়েদের বোঝা বড়োই দায়! সেদিন যখন মঞ্জরী তাকে লম্বা লম্বা কথা শুনিয়েদিয়েছিল, সে তার এক রূপ, এ আর এক রূপ! কোন্ রূপে সে মঞ্জরীকে দেখবে? সত্যিই বোঝা দায় এদের! কি চায় এই মেয়েটি? দু'শো টাকা মাইনের খাতিরের চাকুরিছেড়ে দিয়ে সত্যিই কি সে চলে যেতে চায়?

অথচ বসন্ত দেখছেন মঞ্জরীর ওপর তার মনের মধ্যে কোথায় অনেকখানি স্নেহসঞ্চিত হয়ে আছে। অনেকখানি স্নেহ—অনেকখানি প্রীতি। হেনার সঙ্গে মঞ্জরীরপার্থক্য তিনি ক্রমে ক্রমে বুঝছেন। হেনা সত্যিই আহ্লাদী পুতুল। বসন্তের বয়স হয়েছে, তার মনের সঙ্গে হেনার মনের খাপ খাওয়ানো এখন বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভালই হয়েছে, তিনি হেনার হাত থেকে আংটি ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন। জীবনে একটা বড় ভুলকরতে উদ্যত হয়েছিলেন তিনি। দু'দিনের মোহে সে যে ভুল করতে উদ্যত হয়েছিলেন, জীবনে কোনদিন তার সংশোধন হত না হয়ত। মঞ্জরী দেখতে হেনার মত নয় বটে, কিন্তু দুঃখে সে মানুষ হয়েছে, তার মনে যে বল আছে, হৃদয়ে আবেগের যে গভীরতাআছে হেনার তা নেই। বিলাসিতার ও প্রাচুর্যের আবহাওয়ায় আশৈশব লালিতা হেনার কাছে তা প্রত্যাশা করা যায় না। এই মঞ্জরীর রূঢ় বাক্যেই না আজ তাঁর চোখ খুলেছে! মঞ্জরী তাঁকে চিঠি লিখে গোপনে চলে আসবার পরে এই সব কথা নিয়ে তাঁর মনেঅনবরত তোলপাড় চলেছে। মঞ্জরীকে তিনি চিনেছেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর্তব্যকেওচিনেছেন।

এই সময় স্কুলের চাকর এসে বললে, বাবু, উকিলবাবু এসে গিয়েছেন। আপনাকেসেক্রেটারিবাবু ডাকতে বলে দিলেন।

বসন্ত বললেন, মঞ্জরী, তুমি রান্না করনি আজ? তোমার এখানেই আজ কিন্তু আমি খাব। খেতে না দাও বলো উপোস করে থাকি। তোমার হাতে রান্না খাওয়া—বুঝব তাহলে আমার অদৃষ্টে নেই। আমি এখন চললুম। আসছি কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।

কথা শেষ করে তিনি দ্রুতপদে ঘরের বাইরে চলে গেলেন। দোরের কাছে গিয়ে ফিরে চেয়ে বললেন, মালতীর কথা আমার মনে আছে মঞ্জরী।